প্রসিদ্ধ লালন গীতি "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়…" গানটির গূঢ় অর্থ কী?

বাউল দর্শনের দেহতত্ত্ব নিয়েই মূলত গানটা রচিত। অনেক বিস্তৃত জিনিস। আমি সহজ ভাষায় এ গানটিতে থাকা বাউলদের সিক্রেট কোডগুলোকে একে একে ডেক্রিপ্ট করছি। সহজ করার জন্য ব্যাপারগুলো বিস্তৃত হয়ে যাবে। বিস্তৃত হলেও একটু সময় নিয়ে পড়লে জীবনের গভীর ও অন্যরকম দর্শন লাভ করতে পারবেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বাউল দর্শনে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর কাজগুলো সহ আরো অনেক গানকে বুঝতে পারবেন।

খাঁচা বলতে আমাদের ফিজিক্যাল মানবদেহ কে বোঝানো হয়েছে। খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, পাখিটা কি তা প্রথমেই খোলাশা করবো না। ব্যাপারটা একটু গভীর তাই আগে মাঝখানের কিছু অংশ বুঝে নিই। এতে পাখির যাওয়া আসার ব্যাপারটি ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে।

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা, মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা

কবির প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত খাঁচার আট কুঠুরি হল মানবদেহের মাথার খুলি, ডান-বাম দুই ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, দুই কিডনি আর কোলন। এদের সাথে নয়টি দরজা যুক্ত।

নয় দরজা মানুবদেহ নামক এ খাঁচার বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট এর জায়গা - দুই চোখ, দুই নাকের ফুটো, মুখ, দুই কানের ফুটো, আর বাকি দুইটা জননাঙ্গ ও পায়ু।

কালবের রন্ধ্রসমূহ হলো ঝরকা

“তার উপরে সদর কোঠা আয়নামহল তায়”

এটুকু কথায় লুকিয়ে আছে এক বিস্তৃত অর্থ।

সদর কোঠা মানবদেহের চেতনার সর্বোচ্চ পর্যায় যার অবস্থান মাথার মস্তিষ্কের ওপরে ধরা হয়। যেহেতু বিজ্ঞান প্রকৃতির ব্যাপারগুলোকে হাতেকলমে প্রমাণ করে একে আমরা ভরসা করি। বৈজ্ঞানিকভাবে একটু আলোচনা করি। এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত যে চারপাশে যা দেখছি তা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কিছু তরঙ্গমাত্র। ভিজিবল লাইট বলা হয়। এছাড়াও আছে রেডিও ওয়েভ তরঙ্গ, রঞ্জক রশ্মি বা এক্স রে, ইনফ্রারেড আছে, আমরা ব্যবহারও করছি। সেগুলোও তরঙ্গই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আলোর মত। কারণ আমাদের চোখের সেগুলো দেখার সক্ষমতা নেই। কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই ক্যাচ করতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে আমরা তরঙ্গগুলো বিভিন্ন সিগনালে রূপান্তর করে আলো, রঙ, শব্দ এগুলোতে পরিণত করে নিচ্ছি। বোঝাই যাচ্ছে 'রিয়েলিটি' এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত। আমরা ব্যবহারই করছি এতে অস্বীকারের কোন উপায় নাই। আমরা যা দেখি এটাকে আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভেবে দেখুন আপনি আয়নায় যখন নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন সেই প্রতিবিম্বের কোন দাম আছে? জাস্ট ইল্যুশন। তার ভিতরে না আছে জীবন না সে কিছু করতে পারবে। কিন্তু আয়নার বাইরে আমরা যে আছি এটা আমাদের আপাতদৃষ্টিতে সত্যিকার রিয়েলিটি। বা আমাদের আয়নামহল বলা যায়। কিন্তু আমরা যেটাকে রিয়েলিটি ভাবছি এর উপরেও আরো রিয়েলিটি লেভেল আছে আমাদের যিনি হায়ার সেল্ফ বা আত্মা তিনি তা অবলোকন করছেন। তাঁর অবলোকনটাই এখানে আয়নামহল বলা হচ্ছে। আর সেই আয়নামহলের শুধু একটা প্রতিবিম্ব হলো আমাদের দেখা আলো, রঙ, শোনা শব্দ এসব। ইল্যুশন। এই আয়নামহল টা যারা অনেক সাধনা করে নিজ আত্মাকে অনুভব করতে পেরেছে তারাই কেবল উপলব্ধি করতে পেরেছে। এছাড়া বাকিরা পারছি না এ ব্যাপারেও গানটিতে বলা আছে। তা একটু পরে বলছি। এ আয়নামহলকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়ে থাকে অবেচেতন/অর্ধচেতন মন ৷

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় এ পার্টটা যে বাকি রেখেছিলাম তা এবার ডেক্রিপ্ট করি।

এখানের পাখিটাই হচ্ছে মূল রহস্য বা দম। বাউল দর্শন অনুযায়ী প্রতিটা দমের সাথে সে রহস্য (যাকে নাম দিতে পারছি না) দেহে প্রবেশ করছে, দমটা ছাড়ার সাথে সাথে আবার চলে যাচ্ছে। দমটা ছেড়ে দেয়ার পর আর প্রবেশ করে না করলেই আপনি মৃত। কবি বলছেন খাঁচায় অর্থাৎ দেহে এই অচিন পাখি অর্থাৎ তাঁর আত্মা আসছে আবার যাচ্ছে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে। কীভাবে এ আসা যাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে এ এক রহস্য। যদি তিনি ধরতে পারতেন, মনবেড়ি দিতেন পাখির পায়ে যেন আর যেতে না পারে। তবে এতে মূলত সে রহস্যের ভেদ জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। বা অন্যদের মনে জাগিয়ে গেছেন।

কপালের ফের নইলে কি আর পাখিটির এমন ব্যবহার

খাঁচা ছেড়ে পাখি আমার কোনখানে পালায়?

অনেক সৎকর্মশীল সাধক তাঁর আত্মাকে, নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। আমরা বেশিরভাগ তা পারছি না। একে কবি তাঁর কপালের ফের বলছেন। এটা মূলত লালন ফকিরের লেখনীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। হয়তো তিনি পেরেছিলেন, কিন্তু গানগুলো যেহেতু অন্যদের জন্য লেখা তাই তাদের হয়েই এরূপ বলা। তাদের মনে নিজেকে জানার তৃষ্ণা জাগিয়ে দেয়া। আত্মা বার বার কোথায় পালাচ্ছে তাঁকে ছেড়ে? আফসোস আর তীব্র আকাঙ্ক্ষরই প্রকাশ করছেন লাইন দুইটি দিয়ে।

মন তুই রইলি খাঁচার আশে, খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশের

কোনদিন খাঁচা পরবে খসে লালন ফকির কয়

এখানে আমাদের প্রবৃত্তি, অবুঝ মনের কথা বলা হচ্ছে। সাধকের নিজের দর্শন পেতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ ইল্যুশন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয়। কিন্তু মন আমাদের এই ইল্যুশনে বেঁধে রাখে। সে চিন্তা করে তাঁর খাঁচা বা মানবদেহটির কথা। দেহের কীভাবে তৃপ্তি হয় তা-ই ভাবাতে সর্বদা চিন্তা আনতেই থাকে আমাদের মাথায়। খাবার, সেক্স, মাঝেমাঝে লোভ, হিংসা। হ্যাঁ পৃথিবীতে এই দেহের সার্ভাইভালের জন্য দরকার ছিল এ জন্যেই এগুলো দেহের মাঝে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দরকারটা খুবই সীমিত। কিছু দরকার অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা নিজেদের এতে এমনভাবে ডুবিয়ে ফেলি যে এতেই ডুবে থাকছি শুধু। বাইরের পৃথিবীটাও সেভাবেই ফর্ম করা হয়েছে। যাই হোক মন দেহের আশায় থাকছে, ডুবিয়ে রাখছে, আত্মদর্শন করতে দিচ্ছে না। এই দেহ নিয়ে কত গর্ব, অহংকার। কিন্তু দেহটাতো কাঁচা বাঁশ বা হাঁড় দিয়ে গঠিত। যা কোনদিন খসে পরে এর কোন ঠিক নেই। তা-ই লালন ফকির বলছেন।

লাওৎসু ও অনেকটা এরকমই কথা বলে গেছেন হাজার বছর আগে। তিনি বলেছিলেন দমের সাথে তিনি ভিতরে প্রবেশ করছেন, দম ছাড়ার সাথে সাথে বাইরে বের হয়ে সকল কিছুর সাথে মিশে যাচ্ছেন। সবই খুব গভীর ব্যাপার। লেখা পড়ে বোঝা সম্ভব নয়। হয়তো উপলব্ধিই একমাত্র পথ।